Marupalash

A bengali literary Magazine

Editor
Dewan Abdul Baset

Computer compose
Lubna baset brishti

Advisor
Prof. HelaLuddin Ahmed
Feroj khan

Year 15 issue-2

April 2002

Baishakh 1409 Bangla

সকল যোগাযোগ:

Email: dewana@ngha.med.sa
marupalash@yahoo.com
dewanbaset@hotmail.com

আপনি কি বাংলায় ই-মেইলে লেখা পাঠাতে চান?
আপনি আপনার সম্পূর্ণ লেখাটি কম্পোজ শেষে জাষ্ট
এটাস্‌মেন্ট করে আমাদের পাঠিয়ে দিন।

Marupalash

মরুপলাশ
পঞ্চদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা
এপ্রিল - ২০০২ইং
বৈশাখ- ১৪০৯বাঙলা

প্রকাশনার১৫বছর

চলতি সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন

ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন
ডক্টর মনজুরুল ইসলাম
ফিরোজ খান
মনজুরুল আজিম পলাশ
মেজবাহ্ উদ্দিন জওহের
হাবিবুর রহমান
কাঞ্চন মল্লিক
মীরা
দেওয়ান আবদুল বাসেত
আবদুর রহমান রাজু
হুমায়ুন কবীর
নাবিল হাসান

উপদেষ্টা
অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন আহমদ
ফিরোজ খান

সম্পাদক
দেওয়ান আবদুল বাসেত

কম্পিউটার কম্পোজ
দেওয়ান লুবনা বৃষ্টি

Email : dewana@ngha.med.sa
marupalash@yahoo.com

Published by Marupalash group of Publications, Dhaka, Bangladesh Zonal Office Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

মরুপলাশ বর্ষবরণ সংখ্যা-১৪০৯ বাঙলা

সম্পাদকীয়

স্বাগতম - সুস্বাগতম হে বাঙলা নববর্ষ
এসো...বৈশাখ...এসো...এসো.....

বৈশাখ শুধু মাত্র বাঙলা পঞ্জিকার প্রথম মাসই নয়। বাঙলা এবং বাঙালি সংস্কৃতিরও প্রথম মাস। এজন্যই বৈশাখ আমাদের মননে জাগায় নব নব শিহরণ। পুরো দেশ জুড়ে ব্যবসায়ীদের নতুন হালখাতা খোলা, বৈশাখী মেলা, শিক্ষাও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাঙলা বর্ষবরণ এর আয়োজন, এসবই আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ।
বৈশাখ একটি ভয়ংকর সুন্দর মাস। তাই তাকে আমাদের সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পকলায় বারবারই নতুন রূপে আবিস্কার করি। একে গভীর ভাবে অনুধাবন করেছিলেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম । তাইতো তিনি গেয়ে ওঠলেন - ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কাল বৈশাখীর ঝড় ..... তোরা সব জয়ধ্বনি কর....।।

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত আমাদের বাঙলা নববর্ষ। এই বিভূঁই প্রবাসেও বৈশাখ এসে আমাদের মনের এক তারাতে টুং টাং সুর তোলে। উদাস বাউল বানায় । বাঙলা নববর্ষ নিয়ে যায় আমাদের চিরায়ত বাংলার বটতলার বৈশাখী মেলায়।আমরা স্মৃতির এলবাম খুলে বসি। নষ্টালজিয়ায় ভুগি। নিঃসঙ্গ প্রবাসে এ নষ্টালজিয়ায় ভোগার মধ্যেও রয়েছে পরম সুখ। পরম তৃপ্তি।

আবার বোশেখের রুদ্ররূপ দেখেও আমরা শিউরে উঠি। এই বৈশাখই নিয়ে আসে কালবোশেখী ঝড়। লন্ড-ভন্ড করে দেয় জনপদ, সাজানো সংসার।তবুও বলবো কালবৈশাখীই বানিয়েছে আমাদের লড়াকু মানুষ।

তাইতো বলছি স্বাগতম-সুস্বাগতম হে বাঙলা নববর্ষ এসো বৈশাখ..এসো.. এসো .....

বাংলা নব বর্ষ ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন

বাংলাদেশে এক ধরণের গোঁড়া ধর্মাবলম্বী মুসলমান রয়েছেন, যারা ১লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ পালনকে অধর্ম এবং ইসলামের পরিপন্থী মনে করেন। বৈশাখ শব্দের সাথে তারা হিন্দুয়ানী গন্ধ পেয়ে থাকেন এবং *বঙ্গাব্দ* বা বাংলা ক্যালেন্ডার তারা কোনো ক্রমেই গ্রহণ করতে রাজি নন। এদের ধারণা বিশ্বকর্তা মুসলমানদের হিজরী মাস যেমন মোহররম, রমজান, রবিউল আউয়াল, রবিউস্‌সানি ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না। বিশ্বকর্তার বিশালতা ও গভীরতা সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই স্থুলজ্ঞান থাকায় এ ধরণের উচ্ছ্বাস ও আবেগ অনেকের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বিশ্বকর্তা যেমন বিভিন্ন ধরণের ও জাতের মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন একিভাবে বিভিন্ন রকমের ভাষা ও ক্যালেন্ডার মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর রঙের ও বৈচিত্রের খেলা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে তিনি সব ভাষার মালিক, সব ক্যালেন্ডারের স্রষ্টা-সবকিছুই তিনি জানেন ও বুঝেন। সবই তার। সুতরাং বৈশাখ হিন্দুয়ানী আর হিজরী মুসলমানী- এ ধরণের বিতর্ক নিরর্থক। এ গুলোর দাবীদার হয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ অবান্তর। মহান আল্লাহপাক চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র তৈরী করে দিয়েছেন সময় তারিখ গণনার জন্যে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার তৈরী করার জ্ঞানবুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। তা দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার তৈরী করেছে নিজেদের প্রয়োজনে। ভারতবর্ষে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্ঠান-জৈন ও মুসলমানদের বিভিন্ন পূজা-পার্বন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির সন-তারিখ নির্ণয়ের জন্যে প্রায় ৩০টি বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার রয়েছে। এ গুলোর অনেকগুলোই চন্দ্রভিত্তিক। আবার অনেকগুলো সূর্য ভিত্তিক।

আরবী মাস চন্দ্র ভিত্তিক, তবে ইংরাজি মাস সূর্য ভিত্তিক এবং এ জন্যে এদের মধ্যে বছরে প্রায় ১১ দিনের তফাৎ লক্ষিত হয়। চন্দ্র-বছর (Solar year) ৩৫৪ দিন, ৮ ঘন্টা, ৫৩ সেকেন্ডে হয়। তবে সূর্য-বছর (Lunar year) হতে ৩৬৫দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট ও ৪৬ সেকেন্ডের দরকার হয়।

সম্রাট আকবর সহজে খাজনা আদায়ের জন্যে বাংলা ক্যালেন্ডার বা তারিখ-ই-ইলাহী (আল্লাহর ক্যালেন্ডার) চালু করেন ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে বা (৯৯২ হিজরি)তে। দ্বীন-ই-ইলাহীর মতো এও ছিলো এক সকল ধর্মের সম্মিলন। ঐ সময়ে সম্রাটের খাজনা আদায় হতো শস্য প্রদানের মাধ্যমে। শস্য ফলনের পর পরই খাজনা আদায় হলে সাধারণ কৃষককূল সরকারের উপরে অসন্তোষ হবে না এ জন্যে যে, তখন অভাবের টান নেই এবং তাতে

প্রথমতঃ সহজে খাজনা আদায় হবে এবং দ্বিতীয়তঃ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও কম হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলার মানুষ সব সময়ই খুব স্বাধীনচেতা হওয়ায় সময় সময় তারা দিল্লীর সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করতো- এ অবস্থা এড়ানোর জন্যে সম্রাট আকবর তার দরবারের বিশিষ্ট জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ আমির ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজীকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন এমন একটি সন-তারিখ নির্ণয় করে দেন যাতে নবান্ন আদায় সম্ভব হয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্য বহাল থাকে। তার উপদেশে সম্রাট আকবর ১৫৮৪ সালে বাংলা নববর্ষ চালু করেন। তবে আরবি হিজরি ক্যালেন্ডার অনুস্মরণ করে ৯৬২ বঙ্গাব্দকে বা ৬২২ খৃষ্টাব্দকে প্রথম বর্ষ হিসেবে ধরা হয়। হিজরি ক্যালেন্ডার চালু হয় দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রাঃ) সময় ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই বা ১২ই রবিউল আওয়ালে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং তার ১৬ বছর পর ১২ই রবিউল আওয়ালের পরিবর্তে হিজরি সন শুরু হয় ১লা মোহররমে এবং ৬৩৮ সনের পরিবর্তে ৬২২ খৃষ্টাব্দ থেকে। তাছাড়া বাংলা সন ও তারিখ শব্দ সমূহ আসে আরবি *সানা* (বছর) ও *তারিখ* (দিন বা দিক) থেকে। যেহেতু বাংলা নববর্ষ ফসল আদায়ের জন্যে ব্যবহৃত হতো, সে জন্যে একে ফসলী সন ও বলা হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা সন ও আরবি হিজরি সন এ দুটোই মহানবীর হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করে তৈরী হয়। তবে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে বর্তমানে হিজরি সন হচ্ছে ১৪২৩ আর বাংলা সন হচ্ছে ১৪০৯- এ কেমন করে !?

আগেই বলেছি বাংলা সন মূলতঃ সূর্য ভিত্তিক এবং আরবি সন হচ্ছে চন্দ্র ভিত্তিক। যেহেতু বছরে ১১ দিনের ব্যবধান হয় চন্দ্র ও সূর্য ভিত্তিক হিসাব-নিকাসে। সেজন্যে বাংলা সন ও হিজরি ক্যালেন্ডারের মধ্যে গেল এত বছরে সর্বমোট ব্যবধান হয়েছে ১৪ বছরের। যদিও উভয়ের গণনা শুরুর দিন ধার্য করা হয় একই বছরকে কেন্দ্র করে।

সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্যে অনুরূপভাবে বিভিন্ন ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেক ভৌগলিক এলাকার জনগন সেই সব সন তারিখ বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় কিংবা গ্রেগোরিয়ান (ইংরেজি) সন তারিখ গ্রহণ করেন। তবে উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় বা সামাজিক বিষয়াদিতে এখনো জনগন চন্দ্র ভিত্তিক সন তারিখ ব্যবহার করেন এবং প্রশাসনিক কাজে তার গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার সূর্য ভিত্তিক ক্যালেন্ডার ব্যবহার করছেন।

যেহেতু সম্রাট আকবর হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্খা, দাবী-দাওয়া ইত্যাদির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদ সিরাজী ভারতীয় তিথি (চন্দ্র দিন) রাশী (জডাইয়িক অবস্থান) ইত্যাদি বিষয়ে সুপন্ডিত ছিলেন এবং হাজার বছরের পুরানো ভারতীয় শাকা ক্যালেন্ডারের সাথে পরিচিত ছিলেন, সেজন্যে মাসগুলো স্থানীয় মাসগুলোর

হিসাবে গ্রহন করেন। ভারতীয় ধর্মীয় ক্যালেন্ডারে সূর্য-চন্দ্রের অবস্থান ও দিনক্ষণ নিম্নরূপ। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে নববর্ষ হচ্ছে ১৪ই এপ্রিল, শ্রীলংকায় ১৩ই এপ্রিল এবং

নেপালে ১২ই এপ্রিল- এমন সাদৃশ্য প্রমান করে যে, যদিও আরবি হিজরির প্রেক্ষিতে বাংলা নববর্ষ শুরুর তারিখ নির্ণয় হয়, তবে মাস দিনের সময় নির্ণয় হয় ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের হিসাব-নিকাশ ভিত্তিক।

ভারতীয় ধর্মীয় ক্যালেন্ডার ও সূর্যের অবস্থান

বাংলা তারিখ	সূর্যের অবস্থান	দিনের সময়	গ্রেগোরিয়ান তারিখ
১লা বৈশাখ	২৩ ১৫	৩০.৯	এপ্রিল ১৩
১ লা জ্যৈষ্ঠ	৫৩ ১৫	৩১.৩	মে ১৪
১ আষাঢ়	৮৩ ১৫	৩১.৫	জুন ১৪
১ শ্রাবণ	১১৩ ১৫	৩১.৪	জুলাই ১৬
১ ভাদ্র	১৪৩ ১৫	৩১.০	আগষ্ট ১৬
১ আশ্বিন	১৭৩ ১৫	৩০.৫	সেপ্টেম্বর ১৬
১ কার্ত্তিক	২০৩ ১৫	৩০.০	অক্টোবর ১৭
১ অগ্রহায়ণ	২৩৩ ১৫	২৯.৬	নভেম্বর ১৬
১ পৌষ	২৬৩ ১৫	২৯.৪	ডিসেম্বর ১৫
১ মাঘ	২৯৩ ১৫	২৯.৫	জানুয়ারী ১৪
১ ফাল্গুন	৩২৩ ১৫	২৯.৯	ফেব্রুয়ারী ১২
১ চৈত্র	৩৫৩ ১৫	৩০.৩	মার্চ ১৪

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা ক্যালেন্ডার প্রথম পাঁচটি মাস- বৈশাখ থেকে ভাদ্র-৩১ দিনে হয় এবং বাকী সাতটি মাস টু আশ্বিন থেকে চৈত্র- ৩০ দিনে। তবে প্রতি চার বছর অন্তর যখন বছর ৩৬৬ দিনে হয় (সৌর জগতের কারনে) তখন ৩০ দিনের ফাল্গুন মাস ৩১ দিনে রূপ নেয়। গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারে প্রতি ৪ বছর অন্তর ২৮শে ফেব্রুয়ারিতে ১ দিন অতিরিক্ত যোগ হয়- ফাল্গুন মাস ফেব্রুয়ারিতে অবস্থিত হওয়ায় ফাল্গুনে ১ দিন যোগ দেয়া হয়।

বাংলা বঙ্গাব্দ ১৫৫৬ খৃঃ বা ৯৬৩ হিজরি থেকে গননা করা হয়। কারণ ঐ সালে সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন। পাক-ভারতে রাজা -বাদশার সিংহাসন আরোহন ভিত্তিক ক্যালেন্ডার আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। যেমন-লক্ষ্মনাব্দ, বিক্রমাব্দ, (জালালী সন,

সিকান্দর শাহ সন) শকাব্দ, গুপ্তাব্দ ইত্যাদি। এখানে লক্ষণীয় যে, সম্রাট আকবর আকবরাব্দ না বলে বঙ্গাব্দ চালু করেন। বঙ্গাব্দ শব্দটি সারা বঙ্গের প্রতীক বলে আকবর প্রবর্তিত বাংলা ক্যালেন্ডার বিলীন হয়ে যায়নি। বরং বাংলার জনগন একে নিজেদের ক্যালেন্ডার হিসাবে গ্রহণ করে একে আপন মহিমায় সাজিয়ে রেখেছে- প্রতি বছরে নববর্ষ নতুন আশা ও প্রেরণা নিয়ে বাংলার দ্বারে উপস্থিত হলে জনগন তাকে আপন ভূবনে সাদরে গ্রহণ করে। কবির ভাষায় - *এসো হে বৈশাখ, এসো....এসো.....*

হোয়াইটীকার এলমানাক্ বর্ণিত- (Whitaker Almanac) ভারতবর্ষের ৭টি প্রধান প্রধান ক্যালেন্ডার.....

ইংরেজি ২০০০ সালে ওগুলোতে বর্ষ পর্ব কত তা লিপিবদ্ধ হলো..

* কালি ইউগা	ক্যালেন্ডার-	৬০০১	সাল
* বৌদ্ধ নিরবানা	,,	২৫৪৪	,,
* বিক্রম সমভাত	,,	২০৫৭	,,
* সাকা	,,	১৯২২	,,
* ভিদান্ত জয়তীশা	,,	১৯২১	,,
* বাংলা নববর্ষ বা তারিখ-ই-ইলাহি		১৪০৭	,,
* কল্লাম	,,	১১৭৬	,,

৮ই বৈশাখ ১৪০৯ বাঙলা
২১ এপ্রিল-২০০২ইং
রিয়াদ, সউদী আরব।

যুগে যুগে পহেলা বৈশাখ ও আমাদের সংস্কৃতি

ডক্টর মনজুরুল ইসলাম

আমাদের দেশে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন এখন একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতাত্তোর কালে এবং গত দেড়দশক ধরে পহেলা বৈশাখ রাজধানী শহর এবং অন্যত্র যেভাবে পালিত হচ্ছে, তা আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। গুরুজনদের কাছে ছেলেবেলায় বা এখন থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে যখন শুনতাম, বাংলার মাটিতে কী আনন্দের সাথেই না বৈশাখী মেলা, হালখাতার ব্যবহার, মিষ্টি বিতরণ, আমন্ত্রণাদি, নৌকা বাইচ, বিভিন্ন রকম মেলা, ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। তখন কেবলই ভাবতাম আমরা কখন তা উপভোগ করতে পারবো!

ষাটের দশকের মাঝামাঝি একবার বাঁধা আসে। সামরিক শাসকেরা এই উৎসবের মধ্যে শুধু হিন্দুয়ানীর গন্ধ পেতো; কী কাব্য, কী সাহিত্য, যে কোনোরকম সংস্কৃতি চর্চা, প্রতিটিতেই তারা দেখতে পেতো ইসলাম বিরোধী আচার অনুষ্ঠান। তাদের একবারও মনে হয়নি, বাংলার মানুষ, বাংলার জীবন একটি হাজার বছরের ঐতিহ্য, একটি জাতিসত্তা, একটি সমৃদ্ধ ইতিহাসের উত্তরাধিকারী। তা ইচ্ছে করলেই কৃত্রিমভাবে মুছে ফেলা যায় না। পাঞ্জাব এবং অন্যান্য পাকিস্তানি এলাকার গুরুত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য, গোঁড়া পশ্চিমারা ধর্মের দোহাই দিয়ে পূর্বাঞ্চলের বাঙালিদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে করে রাখতো কোনঠাসা। তারা এটুকু জানতো, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে খর্ব করতে হবে। কিন্তু বেশিদিন তাদের ভ্রান্তনীতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রভাব খাটাতে পারেনি। ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক বিকাশে বাঙালি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

তারই অন্যতম কার্যক্রম বাংলা নববর্ষ পালন। ফি-বছর পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে, আরো গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে উদ্ভাসিত হতে থাকে। এই নতুন প্রজন্মের উদ্দেশেই বর্তমান প্রবন্ধে কিছু তথ্য ও অভিমত পেশ করা হলো।

অপরাপর কিছু নববর্ষ, বিশেষ ঘটনা বা ধর্মভিত্তিক দিনকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত হয়। যেমন, যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন থেকে শুরু করে ইংরেজি গ্রেগরিয়ান নিউ ইয়ার বা নববর্ষ, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) মক্কা থেকে বিদায় হয়ে মদিনা শরীফ চলে যাবার সময় থেকে শুরু হয় হিজ্‌রি সন। মুসলমানদের চন্দ্রমাসের সাথে সৌর মাসের সমন্বয় করে প্রবর্তিত হয় বাংলা সন। এরও সূচনা মুসলমানদের দ্বারা। কারো মতে, বাংলার সুলতান হোসেন শাহের

সময় থেকে, অর্থাৎ পনের শ শতক থেকে বাংলা সনের সূচনা। কারো মতে, সর্বভারতীয় পর্যায়ে, সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫) শাসনামলে চালু হয় বাংলা সন। তবে নববর্ষ পালন শুরু হয় আকবরের আমল থেকেই, তার রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমল-এর রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম পদ্ধতি থেকে। কৃষি উৎপাদনে রবিশস্য ও অন্যান্য ফসল সংগ্রহের মূল সময় বসন্তের শেষে, গ্রীষ্মের শুরুতে বা বৈশাখ মাস থেকে। তখন খাজনা প্রদান করা কৃষকদের জন্য সুবিধাজনক। বলা বাহুল্য, কৃষিপ্রধান ছিল সে সময় গোটা ভারতবর্ষ। বাংলা কালপঞ্জি এভাবেই প্রবর্তিত হলো। কৃষি খাদ্যশস্যের সমারোহ থাকায় এবং এ সময় গাছে গাছে নতুন কচি পাতার আগমন পরিলক্ষণ করে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র নতুন বছরকে সাদরে গ্রহণ করা শুরু হয়। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালির সার্বজনীন উৎসবে পরিনত হয় বাংলা নববর্ষ।

নতুনের সম্ভাবনাই তো জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। পুরানোর দুঃখ, জীর্ণতা, ব্যর্থতা, গ্লানি-সব ধুয়ে মুছে নতুনকে, অজানাকে জয় করার প্রত্যাশায় বাঙালি তৈরী হয় পহেলা বৈশাখ থেকে। দেশজ সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই উৎসব উপলক্ষে গ্রামে গঞ্জে বসে বৈশাখী মেলা, ব্যবসায়ীরা ধরে নতুন হালখাতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী করে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, পত্রপত্রিকা বেতার টিভি প্রভৃতি গণমাধ্যম এবং শিক্ষাঙ্গন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে। সর্বত্র এক উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করে। ঢাকা শহরে ইদানীংকালে নববর্ষ বিশেষ তাৎপর্যের সাথে জাতীয় অনুষ্ঠানমালার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। রাজধানীর বাইরেও বিভিন্নভাবে এই নববর্ষ পালিত হয়। যেমন চট্টগ্রাম জেলায় আমানি খাওয়া, বলী খেলা, ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা জেলায় গরুর দৌড়, নৌকা বাইচ, লাঠিখেলা, রাজশাহী এবং নিকটবর্তী উত্তরাঞ্চলে গম্বীরা গানের অনুষ্ঠান- যা চলে পুরো বৈশাখ মাসে- এগুলো কমবেশি এখনো প্রচলিত। সাংস্কৃতিক জীবন মানেই সুন্দর ও শোভন জীবন- এই সত্যে বিশ্বাস করে বাংলার মানুষ তাদের সাংস্কৃতিক পরিচর্যার অন্যতম দিন হিসেবে পহেলা বৈশাখকে তাদের কালপঞ্জিতে বরাবর অন্তর্ভুক্ত করে রাখবে। এমনকি প্রবাসেও যেখানে যেখানে বাঙালি বসবাস করে, পহেলা বৈশাখ পালনের দৃষ্টান্ত উত্তরোত্তর সেখানেও বাড়ছে বৈ কমছে না।

এই বিশেষ দিনটিতে বড় শহরে বাস করেও নগরবাসীরা ঐতিহ্যবাহী গ্রামীন জীবন প্রত্যক্ষ করে। পিঠা খাওয়া থেকে শুরু করে পান্তাভাতের আস্বাদন, বিভিন্ন হাতের কাজের সাথে পরিচয়, ইত্যাদি সব মিলে যেন এক নতুন- অথচ অতি পুরানো- জগতের কাছাকাছি পৌঁছে তৃপ্তিলাভের সুযোগ হয়। আপন কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং পূর্বপুরুষদের জীবনধারণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে মুহূর্তের জন্য হলেও গর্ববোধ করি। আমরা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিভিত্তিক রাষ্ট্র লাভ করেছি। এখানে সবকিছুর মধ্যে শুধু একটি ধর্ম বা ইসলাি সত্তা তারও মিশ্রণ থাকতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের লোক মূলত বাঙালি মুসলমান।

ধর্মকে আমরা শ্রদ্ধা করবো, ব্যক্তিজীবনে বাস্তবে যতটা সম্ভব আমরা পালন করবো, নিজেদের জীবনধারাকে এর আওতায় প্রবাহিত করবো। কিন্তু আমরা যে বাঙালি, আমাদের সংস্কৃতিতে যে বাংলা মাটির গন্ধ, এই অঞ্চলের অতিসমৃদ্ধ শিল্প-সাহিত্য যে এতে

ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাও স্মরণ রাখবো। আমরা পাশ্চাত্যধারায় সম্পূর্ণ অনৈস্লামিক স্টাইলে নিউইয়ার করবো না, আমরা বাঙালির ঐতিহ্যে লালিত অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করে নববর্ষ পালন করবো, প্রতি পহেলা বৈশাখে কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আহবান করবো.....

এসো হে বৈশাখ এসো.....।

হে বৈশাখ
তুমি নব নব সাজে
এসো আমাদেরই মাঝে।

প্রবাসী বাঙালিদের আপন পত্রিকা দ্বিভাষিক কাগজ "লিংক বাংলা আজই পড়ুন। মনজুরুল আজিম পলাশ সম্পাদিত নতুন শতাব্দির কাগজ লিংকবাংলা।

www.linkbangla.net

বৈশাখের বর্ণিল কবিতা

কবি ফিরোজ খান এর কবিতা
এক টুকরো জলের উঠান

তুমি কি শুনতে পাও মধ্যরাতের হাহাকার
হয়তো তারার আসরে দুঃখেরা কথা বলে
কিম্বা কুয়াশার স্তর ভেদ করে
নেমে আসে আকাশের কান্না।

যদি বন-বনান্তের তরু শাখা থেকে
কান্নার রোল উঠে
যদি রাতের শরীর থেকে নদীরাও জেগে উঠে
শোকের তরঙ্গ নিয়ে
হয়তো ঝি-ঝি পোকারা জুড়ে দেয়
বিরহী মাতম
দক্ষিনা বাতাসে ভেসে আসে
সাগরের কান্না

রাতের সিথানে ঘুমিয়ে পড়া ফসলের মাঠ থেকে
ছড়িয়ে পড়ে শোকের মিছিল
শিশিরের ধুসর মাঠ জুড়ে জেগে উঠে
ঘুমন্ত পাখির ডানা
তখন খুঁজে দেখো বন্ধু
হয়তো আমিও মিশে আছি বিরহী চাতকের ভীড়ে
কিম্বা রাত জাগা কোন পাখির
হা হুতাশ হয়ে-
জোছনা ধোয়া রাতে অহেতুক খুঁজে ফিরি
বৃষ্টির ছোঁয়া।
কিম্বা মেঘহীন রোদ্রের উঠান জুড়ে
তৃষ্ণার্ত বলাকার সাথে আমিও খুঁজে ফিরি ছায়াতরু
পল্লবীর ফাঁকে- এক টুকরো জলের উঠান।

ফিরিয়ে দাও বৈশাখ

হাবিবুর রহমান

এ কোন বৈশাখ এলো নিদাঘের তপ্ত দুপুরে
ফাহিমার কান্না শুনি টোলারবাগের টং ঘরে।
এ কোন বৈশাখ এলো কোজাগরী জ্যোৎস্নায়
পূর্ণিমার চাঁদ গিলে খায় ভয়াল রাহুর গ্রাস!
এ কোন বৈশাখ এলো বাঙালির ঘরে ঘরে
সংক্রান্তির অমঙ্গল কান্না শুনি রাতে ও দুপুরে।

আমিতো চাই না চন্ডালী বৈশাখী জলে
ভিজে যাক আনন্দের উঠোন।
আমিতো চাই না শ্বাপদ নির্ঘোষে
ঝরে পড়ুক আধফোটা মহিমাবকুল।
কালবোশেখী ঝড়ে ভেঙ্গে যাক খুকুর শাখা
মুছে যাক সিঁথির সিঁদুর
ধর্ষিতা শিখারানীর কোলের শিশুর দুধেল হাসি।

চাই না চাই না এ মাৎস্যন্যায় বৈশাখ প্রভু!
ফিরিয়ে দাও ভালবাসার নদী ও বৃষ্টি।
অবগাহনে পবিত্র হোক দেশ ও মানুষ
নন্দিত করপুটে ধরে রাখবো আমি
আর্সেনিক মুক্ত বৈশাখী বৃষ্টি ও নদীর বিমল জল।

আমার হাজার বছরের সাধনায় ফুটে উঠবে
নববর্ষের শতাব্দী ফুল।
আমি তার মধুগন্ধী মলয়ে ভিজবো বৃষ্টিতে
সাঁতরাবো কুয়াশা নদীতে।
বৈশাখী মেলায় হাটবো সঙ্গিনীর ধবল বাহুর স্পর্শে
রোমাতংকহীন ভালবাসার বাগানে চাষ করবো
তেরোটি প্রজাতির নতুন গোলাপ।
শংখ ধবল ফুসফুসে নেবো বটের সবুজ নিঃশ্বাস
প্রভু! ফিরিয়ে দাও আবহমান বৈশাখ আমার।

২২-৪-২০০২

জেদ্দা

চিল শকুনের কবর হোক

মেজবাহ্ উদ্দীন জওহের

(রমনা বটমূলে ১৪০৮ বাঙলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলার প্রতিবাদে)

বোশেখ মাস দ্বার খুলেছে প্রভাত পাখি ধরছে তান,
কাল বোশেখী বেজায় খুশি এবার হবে আগুন গান।
নতুন বছর আসছে ওগো পুব-আকাশে রক্ত লাল,
দখিন হাওয়া বললো- এখন ফুল-পাখিদের প্রণয়কাল।

প্রভাত হতেই বটের মূলে পায়রা উড়ে ঝাকে ঝাক
হলুদ বরণ ভালোবাসায় আকাশ তাকে দিচ্ছে ডাক।
বাজ-শকুনে যুক্তি করে- এমন সুযোগ আসবে না।
চলো মোরা ঝাপিয়ে পড়ি ভালোবাসা হাসবে না।

থাকবে কেবল আঁধার প্রিয়া আলো তুমি নিপাত যাও,
কালো মেঘের আঁড়ালটাতে সূর্য তোমার মুখ লুকাও ।
ঝাপটে পড়ে আকাশ হতে রক্তলোভী হাজার বাজ্
কালো ধোঁয়ার অন্তরালে পায়রাগুলি সব লোপাট।

পাতার দোলা ফুলের হাসি গানের লহর পাখির ডাক,
এক নিমেষেই নিভে গেল হিংসা কেবল বেঁচে থাক।
আসবে প্রচুর বুটজুতো আর নেতা-নেত্রীর কূট-কচাল,
মেলবে নাতো চোখটি আহা! বোনটি ঘুমাও চিরকাল।

বিচার! সেতো সোনার হরিণ যায় না ধরা কিছুতেই,
চক্ষু এড়ায় পালিয়ে বেড়ায় হত্যাকারীর পিছুতেই।
এমন কেন হয় না আহা! সাগর কেন গর্জেনা,
আকাশ ভেঙ্গে বজ্র কেন তাদের মাথায় বর্ষে না।
লক্ষকোটি প্রাণের ঘৃণায় উথলে উঠুক সবার বুক,
ঘৃনার সাথে নিত্য সেথায় চিল-শকুনের কবর হোক।

চাঁদ

মনজুরুল আজিম পলাশ

ভোরের শিশিরে পা ভিজে যাওয়া
বিস্তীর্ণ ভূমিতে আমরা হাঁটতে চেয়েছিলাম।
এ দেশে
বেঁচে থাকবার জন্য যতটুকু অস্বচ্ছতা প্রয়োজন
আমাদের তা ছিল না।
আমাদের যতটুকু অস্বচ্ছতা
ঠিক ততটুকু কষ্ট।

আমরা বাঁচতে চেয়েছিলাম সবটুকু স্বচ্ছতা নিয়ে
এ সমাজ কি আমাদের নেবে?
আমাদের কি বার বার যেতে হবে
দূরে কোথাও?
পূর্ণ চাঁদের কাছে জীবন ভালবেসে।

(খ)

ঋণ

খুব বেশী ঋণী হয়ে পড়েছি
চারদিকে ঋণের দোচালা ঢেউটিন
বাসন-কোসন-সবুজ-গেলাস সব ঋণ দিয়ে তৈরী
দেয়াল, দেয়ালের ইট-সুরকী-বালি-সিমেন্ট সব
এমনকি
আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসও
অক্সিজেনের কাছে ঋণী।

মরুকাব্য

এসো হে বৈশাখ

দেওয়ান আবদুল বাসেত

এসো হে বৈশাখ এসো
ঋতুরাজের বর্ণিল চুমু শেষে
গ্রীস্মের দাবদাহ নির্মেঘ আকাশে
গেরুয়া বসনে ক্ষ্যাপা বাউলের একতারাতে
কবি জসিমের নকশীকাঁথার মাঠে
কিংবা তুমি এসো সোঁজন বাদিয়ার ঘাটে
আমার চোখে রঙধনু হয়ে বর্ণালী ধারাপাতে
এসো তুমি আজ শত রঙ নিয়ে এসো।
এসো হে বৈশাখ এসো
রবি ঠাকুরের বিশ্বমানবতার গানে গানে
হাছন-লালনের উদাসী বাউল প্রাণে
শ্যামা-দোয়েলের শিস্ দেয়া টানে,
তুমি এসো পুরাতন -পচার বিনাশী আচরণে
ট্রাফালগার স্কোয়ারের সিংহমূর্তির ভীষণ গর্জনে
ভয়ংকর সুন্দর দু'টি আঁখি নিয়ে তুমি এসো !!
তুমি এসো আজ এসো
দূর প্রবাসে বাঙালির হৃদয়-বুকে
তালপাতার বাঁশি, বটতলার মেলা সুখে
শানকি ভরা পান্তা-মরিচের স্বাদে
সোঁদা মাটির গন্ধ পেতে এ মন-মৃত্তিকা কাঁদে
হাজার বছরের স্বজন তুমি, তুমিই সাহস - ডর
লাখো মানুষের বুকে গড় তুমিই বিরানচর
কবির ভাষায় তবু গেয়ে ওঠে ওরা -
'ওই নতুনের কেতন উড়ে কাল বোশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর'.....।।

প্রেমের চিঠি

মীরা

প্রিয়া তোমায় লিখবো চিঠি মিঠে শব্দ পাই নি খুঁজে

কাগজ কলম হাতে নিয়ে অনেক সময় যাচ্ছে ঝরে
ধর্ম-ঘটি সব শব্দ গুলো বিদ্রোহী নাকি বুঝে-সুজে
হয়তো ওদের আসতে দেরী আসবে ওরা অনেক পরে ।

কেউ নাকি কাব্যে বন্দী , গল্প কথায় ছলা কলায় পগার পার
কেউ বা আটক নতুন প্রেমে, বাক চাতুরীর নগরীতে
তোমায় চিঠি লিখতে গিয়ে তাইতো লেখা হয়নি আর
ক্ষমা সুন্দর করে দেখো ব্যর্থ আমার কলগীতে ।

তুমিতো প্রিয়ে ডুবে আছো আজ অযুত শব্দের গালিচায়
আমার চারিদিকে রয়েছে শুধু ধূলিময় মরু হাহাকার
মায়ের ভাষাও ভুলতে বসেছি হায় !
চিঠি লেখা তাই হয়নি আর ।

তোমার প্রতিক্ষায়

কাঞ্চন মল্লিক

হাঁ, তোমাকে জানা গেলো
চেনা গেলো
তুমি সাগর পাড়ের বিভাষ,
কুমুদিনী কুমুদ বাসর
এসো একদিন চুপি চুপি
নিঃশব্দে নির্বাকে,
নূড়িতে পা দিওনা
পা দিও বিলম্বিত লয়ে
অক্ষত বালুকা বেলায়।
দাদ্‌রায় ছুটে এসো
তালুতে বাজে যেন রুনুঝুনু
এসো আমার শব্দালয়ে
দু'ঘন্টা হাতে করে।
সূর্য যেন না দ্যাখে
ভোরে ভোরে
অধরে কুয়াশা মেখে।
আমি প্রতিক্ষায় র'লাম
কবিতার সাজঘরে

ছড়াশিল্পী দেওয়ান আবদুল বাসেত এর
অমর একুশ ও বৈশাখের গুচ্ছ ছড়া

বকুল হয়ে ঝরে

ব-এর মানে বরকত হবে
র-এর মানে রফিক,
বাঙ্‌লা দাবীর মিছিল করে
জব্বার এবং শফিক ।
মায়ের ভাষার তরে
বকুল হয়ে ঝরে!
পড়লো ঝরে আরো কতো
বাঙলা প্রেমী ছালাম,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফুলে
ওঁদের করি সালাম ।

জব্বারের ছবি

লাল শিমুলের পাপড়ি দেখে
জব্বারের ওই ছবি এঁকে
ফাগুন দিনে আগুনঝরা
ফুটলো হাজার ফুল,
করতে স্মরণ ভাষার সেনা
হয়নি তাদের ভুল!

রক্ত দিয়ে কেনা

এই মাটিতে মিশে আছে
বাঙলা ভাষার সেনা,
তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে
বর্ণমালা কেনা!

একুশ মানে

ফেব্রুয়ারীর একুশ মানে
ফাগুন মাসের আট,
মায়ের চোখে খোকন সোনার
রক্তে ভেজা শার্ট!
একুশ মানে-
রাষ্ট্রভাষা বাঙ্‌লা দাবীর ঝড়!
ঘর ছেড়ে যে ভাইটি গেলো
ফিরলো না তারপর!
একুশ মানে-
ভাষার সেনা শহীদ হবার দিন,
থাকবে মিলন কথায়-কাজে
শপথ করার দিন ।

চাষ

এই দেশেতে জন্ম আমার
এই মাটিতে বাস,
মা করেছেন আমার বুকে
বর্ণমালার চাষ!

মায়ের ভাষা

আমার মায়ের ভাষা যারা
পাল্টে দিতে চায়,
শক্ত শেকল দিয়ে তাদের
বাঁধবো বুটের পায়!
লিখবো মায়ের ভাষায় চিঠি
হাসবে চাঁদও মিটি মিটি ।
বাঙ্‌লা চিঠি বলবে কথা
সকল ঠিকানায়,
যেম্‌নি মায়ের কথা-সুরে
সব পাখিরা গায় ।

শহীদ মিনার

শহীদ মিনার শহীদ মিনার
জলে ভেজা চোখের কিনার
বক-ধার্মিক আমরা সবে
কে দেখেছে এমন কবে!?
বর্ণমালার বুকে চেপে
আমরা করছি লান্স ও ডিনার!
শহীদ মিনার শহীদ মিনার । ।

তোর পরিচয় কি?

আমার দাদা বীরডুবুরি
বাবায় বাঘের-টাগ্,
দাদার দাদায় বন্ধু বানায়
বাঘের সঙ্গে ছাগ্ !
খালু ,ফুফা 'কীট্স্ ও শেলী'
খালায় নভোচারী,
ইচ্ছে হলে দিতেই পারি
সপ্ত আকাশ পাড়ি।
হাস্‌লি কেন ? ফাজিল তোরা
বোকা ব্যাঙের ছানা,
আমার দাদার চাকর ছিলো
তোদের বাবার নানা।
বৃদ্ধ কোলা বল্লো রেগে,
ওগো বীরের ঝি -
সব পরিচয় পেলাম তবে
তোর পরিচয় কি ?

রোম ফাঁটালো কারা?
ছায়ানটের বর্ষবরণ
বটের মূলে যাঁদের মরণ
কিন্তু ওরা কারা?
আমরা জানি কারা
কর্তা নাকি কর্ম-করণ
দেখতে কেমন পোশাক-গড়ন
বাঙলা এবং বাঙালিদের
ঘৃনা করে যারা।
বর্ষ শুরু মাস
রক্তে আমার দ্রোহের আগুন
ধরতে ওদের সবাই জাগুন
আমরা সবে প্রতিবাদী
চাইবো তাদের লাশ!
ওরে আমার পাগলা বাউল
কালবোশেখী ঝড়,
সপ্ত-আকাশ নিয়ে তাদের
উপর ভেঙ্গে পড়।

আমরা সবেপ্রতিবাদী

ঝড়ো মাতা বৈশাখ

নতুনের কথা কয়,ঝড়ো-মাতা বৈশাখ,
আম্র মুকুলে ভরা,ফুল,পাতা,ওই শাখ ।
বৈশাখী নাচে তাতে ছিঁড়ে পাতা, ফুল ;
দানবী কী বৈশাখী ? না-না ওটা ভুল !
ঝড়ো হাওয়া এলে শত ভেঙে যায় ঘর,
ভেঙে পড়ে গাছ-পালা, ভাঙে নদী-চর !
তবে কীগো বৈশাখী আমাদের ও পর ?
না না । সেতো ভুল গুলো ঝেড়ে করে ছাপ্,
ধুয়ে-মুছে দেয় যতো ছিলো পাপ ও তাপ !
বৈশাখী ভাঙে শুধু নতুনের জন্য
সক্কালে সুজনেষু, বৈকালে বন্য !
ভাঙাটাকে যেন মোরা গড়তে পারি,
সেই কথা বৈশাখী বলে প্রতিবারই !

বাঙলা ভাষার লিমেরিক

বাঙলা ভাষার দাবী নিয়ে তুললো যাঁরা ঝড়
আটই ফাগুন ছিলো তখন ভীষণ ভয়ংকর!
চাইলো তাঁরা ভাষার মান
গুলীর মুখে হারায় প্রাণ
সেই শহীদের শপথ ছিলো ' কর্ নতুবা মর্'!!

ফিরে এলো ফাগুন

ফিরে এলো ফাগুন
দেখনা চেয়ে দেখনা চেয়ে কৃষ্ণচূড়ায় আগুন!
শিমুল পলাশ জবা
রক্তেভেজা ফুলগুলো সব করছে শোকের সভা!
রক্তগুলো তাঁদের
মায়ের ভাষা আনতে গিয়ে লাগলো গুলী যাঁদের ।
ফাগুন এলে ঘুরে–
সেই শহীদের স্মৃতি ছায়ায়,
আমরা ছুটি মোহন মায়ায়;
গান গেয়ে যায় কোকিলগুলো কুহু কুহু সুরে ।

শিশু-কিশোর গল্প

লাল মুরগী ও তিন অলসের গল্প

দেওয়ান আবদুল বাসেত

সেই অনেক দিন আগের কথা। তখন আফ্রিকার জঙ্গলের ঠিক মাঝামাঝি ছিলো ছোট্ট একটি জলাশয়। তারই পাশে ছিলো ছোট্ট একটি খড়ের ঘর। আর তাতে বাস করতো সেই জঙ্গলের মা-বাপ হারা এতিম এক লাল মুরগীর ছানা। ভোর-বিহানে ঘুম হতে উঠেই কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে সকালের কাজে মনয়োগ দিত। ঘন্টাখানেক কাজ করে এসে নিজ হাতে নাস্তা তৈরী করে খেত। তারপর গোসল করে স্কুলে যেত। বিকেলে সে একঘন্টা কাজ আর আধা ঘন্টা খেলা-ধুলা করতো। এ ছিলো তার নিত্যদিনের রুটিন। কেন না সে নিয়মের বাহিরে চলতে পছন্দ করতো না। সে তার মা-বাবার নিকট শোনেছিলো- নিয়ম অনুযায়ী না চললে আর কঠোর পরিশ্রম না করলে জীবনে উন্নতির আশা করা যায় না।

একদিন সকালে সে বাগানের ফুল গাছে পানি দিচ্ছে। ঠিক এমনি সময় সে দেখতে পেলো একটি কুকুর ছানা, একটি বিড়াল ছানা, ও একটি রাজ হাঁসের ছানা তারই বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। তারা কাছে আসলে লাল মুরগীর ছানা তাদের জিজ্ঞেস করলো- **এমন সাত-সকালে** তোমরা কোথায় যাও। তারা তিন জনই হাউ-মাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলো। কান্না থামিয়ে তারা বলতে থাকে- আমাদের মা-বাবা মরে গিয়েছে। আমাদের থাকার কোন জায়গা নেই। আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই যে সেখানে গিয়ে উঠবো। এখন তুমি যদি দয়া করে আমাদের একটু জায়গা দাও তা হলে আমরা খুবই উপকৃত হবো।

লাল মুরগীর ছানার খুবই দয়া হলো তাদের কথা শোনে। কেন না সে নিজেও মা-বাপ হারা এতিম। ওরাও এতিম। যাক ভালোই হলো। অন্ততঃ সাথী পাওয়া গেলো। এই গহীন জঙ্গলে তাকে আর একা থাকতে হবে না। সে তাদের থাকার অনুমতি দিলো।

রাজ হাঁসের ছানাটি সারাদিন খোশ-গল্পে নিয়ে মেতে থাকে। কোন কাজে আর লেখা-পড়ায় তার মন নেই। পাড়া-প্রতিবেশীদের ডেকে সে গল্প জুড়ে দেয়। বিড়াল ছানাটি আবার এসব গল্পের ধারে-কাছেওনা। সে সাড়াদিন শুধু সাজ-গোজ নিয়েই ব্যস্ত। নখ পলিশ করবে। চোখে কাজল লাগাবে। পোশাকের পর পোশাক বদলাবে। এ ভাবেই কেটে যায় তার দিন। কুকুর ছানাটির চোখে রাজ্যের ঘুম। দেখে মনে হবে তার কোনই চিন্তা নেই। সে যেন ঘুম নিয়েই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে। সে যেন জমিদার ঘরের সন্তান। যেন চাকর-বাকর রয়েছে বহু । তারাই তার সব কিছু রেডী করে রাখবে। নেংটি ইঁদুর ছানারা এসে তার নাকের ডগার উপর লাফাতে থাকে অথচ তাতেও তার ঘুম ভাঙবে না। সে চোখে রুমাল বেঁধে দিনে ঘুমাবে যাতে সূর্যের আলো তার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে।

অথচ তাদের আশ্রয়দাতা সেই লাল মুরগীর ছানা একাই ঘরের সকল কাজ নীরবে করে যাচ্ছে। সে খানা পাকাবে। ঘর-দোর পরিস্কার করবে। সবার কাপড়-চোপড় ধুয়ে দেবে। রান্না ঘরের ও অন্যান্য সকল আবর্জনা সে প্লাষ্টিক ব্যাগ ভরে বাহিরের ডাষ্টবিনে ফেলবে। বাড়ির লনের ঘাস কাটবে এবং কাটা ঘাসগুলো অন্যান্য গাছের পড়ে থাকা পাতা পরিস্কার

করে ডাষ্টবিনে ফেলবে। এমনকি সে বাজারে গিয়ে বাজার সওদা ও করে আনবে।

একদিন লাল মুরগীর ছানা সকালের বাজার করার জন্য বাজারে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে সে বেশকিছু
বীজ গম দেখতে পেলো। সে সযত্নে তা তুলে তার ব্যাগে রাখলো। বাজার শেষে যখন সে ঘরে ফিরলো তখন সে তার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলো- তোমাদের তিন জনের মধ্যে কে আমার কুড়িয়ে পাওয়া বীজ গমগুলো জমিনে রোপন করবে? তাতে কিছুটা কষ্টতো হবেই। জমিন তৈরী করতে হবে। ঘাস পরিস্কার করতে হবে। বীজ বপন করার পর তাতে পানি সেচ দিতে হবে। তারপর যে ফল পাওয়া যাবে। সেগুলো মেইল এ নিয়ে গুড়ো করে আটা বানাতে হবে। সেই আটা দিয়ে বরফ জমা, তুষার ঝরা কোন প্রবল শীতের ভোরে আমরা কেক বানায়ে মজা করে খেতে পারবো। বাড়ীর সকল কাজতো আমিই করি। এবার তোমরা দয়া করে কিছু কর।

হাঁস বললো-স্যরি আমি পাড়ার ছেলে-মেয়েদের গল্প শোনানোর কাজে খুবই ব্যস্ত। আমি এ কাজ করতে পারবো না।
বিড়াল বললো- আমার দ্বারা এ কাজ মোটেই হবে না। তাতে আমার কাপড়-চোপড় নষ্ট হয়ে যাবে। হাতে কড়া পড়ে হাতের নরম তুলতুলে ভাবটিই চলে যাবে। দয়া করে তুমিই করগে সে কাজ।
কুকুর বললো- আমি এতো ক্লান্ত যে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়।

তিন বন্ধুর এমনতরো কথা শোনে লাল মুরগী নিজেই সিদ্ধান্ত নিলো যে, সে নিজেই এ কাজ করবে। সে তাদের জানিয়ে দিলো -তোমরা যখন ভাবছো এ কাজটি শুধুই আমার। ঠিক আছে তাহলে আমার কাজ আমিই করবো।
এবং সে তা করলো।
কয়েক দিনের মধ্যেই সেই বপন করা বীজ গম থেকে কচি পাতা মাটি ভেদ করে উপরে উঠলো। তা দেখে লাল মুরগী আনন্দে কেঁদে ফেললো। তার সকল বন্ধুদের ডাকলো- দেখ দেখ আমার বপন করা বীজ গমেরা চারা দিয়েছে। এখন বলো কে আমাকে সাহায্য করবে এমন কড়া গরমের মৌসুমে এদের দেখাশোনা করার। এদের যত্ন নেবার। এতে নিয়মিত পানি সেচ না দিলে এবং আগাছা ছাপ না করে দিলে এরা মরে যাবে।

হাঁস বললো-(ফ্যাঁক ফ্যাঁক) আমি পারবো না।
বিড়াল বললো- আগামী শীত মৌসুমের পূর্বে আমার গান-নাচ শেখা শেষ করতে হবে। সা রে গা মা পা- আমি পারবো না তোমার কাজে সাহায্য করতে।
কুকুর বললো- ঘেউ---ঘেউ... আমার শুধু ঘুম ঘুম, আর খিদে খিদে ভাব। আমিও পারবো না।

যখন তিন বন্ধুতে একই জবাব দিলো। তখন লাল মুরগী বললো- এটাও আমার কাজ। আমার জন্যই আমি এ কাজটি করবো। সে তাই করলো। পুরো গরমের মৌসুমটি সে খুবই যত্ন নিলো তার ফসলের। সে তাতে নিয়মিত পানি সেচ দিলো। প্রতিটি সারির মধ্যে সে আগাছা জন্মেছিলো, তা পরিস্কার করে দিলো।

ক্ষেতে গমের চারাগুলো বেশ লতিয়ে উঠেছে। তারা ফলবতী হয়েছে। এবং ফল দিয়েছে। তা দেখে লাল মুরগী আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে। গ্রীস্ম পার হতে চলেছে। গমের ফল দেয়া গাছগুলো সবুজ থেকে এখন সোনালী হয়ে ওঠেছে। এবার জমিন হতে কেটে তা ঘরে নিয়ে আসার পালা।

লাল মুরগী আবার তার বন্ধুদের সাহায্য চাইলো।
- তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে গমগুলো জমিন হতে কেটে মাড়িয়ে ব্যাগ ভরে ঘরে আনতে?
কুকুর ঘেউ---ঘেউ সুরে বললো দুঃখিত আমি তা পারবো না।
বিড়াল মিউ মিউ সুরে বললো- কাজটি কঠিন। আমি পারবো না।
হাঁসটি কয়েক পাক ঘুরে ফ্যাঁক ফ্যাঁক করে বললো - আমার অন্য কাজ আছে। আমি পারবো না।

'ওয়েল -ওয়েল' তোমরা তোমাদের নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকো। এ কাজটিও আমার। অতএব আমার কাজটি অমিই করবো। কথাগুলো বলেই লাল মুরগী কাজে হাত দিলো। এবং তা শেষও করলো।
এবার গমগুলো মিলে নিয়ে গিয়ে তা গুড়ো করে আটায় পরিনত করতে হবে। তোমাদের কিছুটা কষ্টতো হবেই। মিলটি মাইল দুয়েক দূরে। লাল মুরগী এবার নিজ হাতে গমগুলো একটি বড় ব্যাগে ভরে তার মুখটি শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে দিলো। এবং একটি ছোট্ট ট্রলীতে ভরে বন্ধুদের
জিজ্ঞেস করলো - তোমরা কেউ কি এবার আমাকে সাহায্য করবে ইহা মিলে নিয়ে যেতে ??
তিন বন্ধুর সেই পুরোণো একই নাকানী সুর-আমরা পারবো না। কাজটি যেহেতু তোমার। তাই নিজেই করগে প্লিজ!!

হ্যাঁ ঠিকই বলেছো। কাজটি আমার নিজের। তাই আমাকেই করতে হবে। ওয়েল আমি নিজেই যাচ্ছি।
সে গমগুলো ট্রলীতে ভরে নিজেই মিলে চলে গেল। মিলের মালিক ভল্লুক মহাশয় গমগুলো মিলের চাক্কিতে দিয়ে গুড়ো করে আটা বানালো। এবং তা লাল মুরগীর হাতে তুলে দিয়ে বললো- তোমার কাজ হয়ে গেছে। এই নাও। লাল মুরগী আটার ব্যাগটি ট্রলীতে করে বাড়ি ফিরে এলো।

খুব বেশী দিন পরের কথা নয়। মাত্র কিছুদিন পর ধীরে ধীরে দক্ষিণের বাতাস বইতে লাগলো। দেখতে দেখতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। দিন ভর খুবই বৃষ্টি হলো। এরপর থেকে উত্তরের ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করলো। তখন শীত বেশ ঝেঁকে বসেছে। তুষার পড়তে শুরু করলো। জায়গায় জায়গায় শাদা তুলোর মতো তুষার ও বরফ জমে সবুজ ঘাসকে ঢেকে রেখেছে। ঘাসখেকো প্রাণীগুলো ঘাসের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে এই বরফের উপর। কেউ কেউ আবার তুষার সরিয়ে মাথা নীচে ঢুকিয়ে ঘাস তুলে আনছে। সে দৃশ্য বড়ই মনোরম।

তেমনি এক সুন্দর সকালে লাল মুরগীটি ঘুম থেকে উঠেই ভাবলো আজই সে প্রকৃত দিন যে দিনের অপেক্ষায় সে এতোদিন করেছিলো। এ দিনেই 'হোম মেড কেক' এর স্বাদ আর রুটির স্বাদ হবে চমৎকার। তাই সে তার হাঁস, কুকুর, বিড়াল এই তিন বন্ধুদের ডাকলো। - বন্ধুরা কে আমাকে সাহায্য করবে রুটি আর কেক বানাতে? আজই সেই মজার দিন । যে দিনের অপেক্ষায় আমি গমকে আটায় পরিণত করে ঘরে এনে রেখেছি।
এবারও তারা বললো- গরম কম্বলের নিচে আমরা বড়ো মজার ঘুমের আমেজে আছি। এই মজা রেখে আমরা রুটি আর কেক এর মজা চাই না। বরং এটাও তুমি করো। মজাটা তুমি একাই গ্রহণ করো।
ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমরা ঘুমাও। কাজটি আমিই করছি। যেহেতু এটাও আমার কাজ। এই বলেই লাল মুরগী কাজে মনোযোগ দিলো। সে আটার সঙ্গে দুধ, ডিম, মাখন এবং লবন মিশায়ে তাতে কিছুটা পানি ঢেলে খামির বানাতে থাকলো। শেষে একটি পাউরুটি বানানোর পাত্রে তা পুরে
দিয়ে সে পাত্রটি বৈদ্যুতিক ওভেন এ ঢুকিয়ে দেয়। এবং সেখানে সে অপেক্ষা করতে থাকে। যাতে তা আবার পুড়ে না যায়।
কেক যখন তৈরী হয়ে এলো তখন তার সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এমন সুগন্ধ পেয়ে সেই তিন অলস কুকুর, বেড়াল, হাঁস কেউ আর ঘুমুতে পারলো না। তারা শীতের সকালের সেই গরম কম্বল ফেলে দ্রুত উঠে এলো কিছেনের কাছাকাছি। তারা লাল মুরগীর কাছে জানতে চাইলো-সে এমন কী পাকাচ্ছে যার সুগন্ধে মাতাল হয়ে তারা শীতের মজার বিছানা রেখে এ সাত-সকালে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছে।
লাল মুরগী শুধু বললো-নিজের জন্যই কিছু একটা তৈরী করছি। এতে তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে থাকলে আমি সত্যি দুঃখিত। এ বলেই সে ওভেন থেকে কেকটি বের করে

আনলো। আর তার মৌ মৌ গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। লাল মুরগীর তিন অলস বন্ধু সে গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে তার চারিদিকে এসে ঘিরে দাঁড়ালো।
লাল মুরগী এবার সবার দিকে চেয়ে বললো- আমার বানানো এ কেকটি খেয়ে শেষ করতে তোমরা কে কে আমাকে সাহায্য করবে?
বিড়াল লাফিয়ে উঠে বললো- মিউ মিউ.. আমি তোমাকে সাহায্য করবো।
কুকুরটি দু'পা এগিয়ে এসে বললো-ঘেউ..ঘেউ আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।
হাঁসটি জোরে ফ্যাঁক ফ্যাঁক করে উঠে বললো- সবার চেয়ে আমি তোমাকে বেশী সাহায্য করতে পারি।
বেশ বেশ। এবার লাল মুরগী বললো-এবার শুধু খাবার বেলায় দেখছি সবাই সাহায্য করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছো। এবার বলতো গমের জমিন তৈরীতে এবং তা বপন করে তার যত্ন নিতে কে কে আমাকে সাহায্য করেছিলে?
কেউ না।
তা আমি একাই করেছি।
জমিন হতে গমগুলো কেটে এনে মাড়াই করে গম আলাদা করে ব্যাগে ভরা পর্যন্ত কে কে সাহায্য করেছো?
কেউ না।
অমি একাই তা করেছি।
শেষে গমগুলো মিলে নিয়ে গুড়ো করে আটা বানাতে তোমরা কি কেউ সাহায্য করেছো?
কর নি।
তা কিন্তু আমি একাই করেছি।
সর্বশেষে এক কেক বানাতে কেউ কী আমাকে সাহায্য করেছো ?
কর নি।
আমি তা একা একাই করলাম।
তোমরাই বলেছো এটা আমার কাজ। ওটা আমার কাজ। তাই সব কাজই আমি একা করেছি। কেন না সেগুলো আমার কাজই ছিলো। তাই কেকটি খেয়ে শেষ করাও কিন্তু আমারই কাজ। তাই আমি এটা একাই খেয়ে শেষ করতে পারবো। এখানে আর কারো সাহায্য দরকার হবে না।
এ বলেই সবার সামনে লাল মুরগী কেকটি মুখে পুরে দিয়ে সবাকে দেখিয়ে মজা করে খেতে লাগলো।
অন্য সবাই তাতে আফসোস্ করে করে নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগলো। কেন তারা তখন লাল মুরগীকে সাহায্য করে নি। তার কাজে সাহায্য করলেইতো আজ এমন মজার খাবার হাত ছাড়া হতো না।

বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে

কেমন আছি আমরা প্রসঙ্গে - আমাদের কিছু কথা

হুমায়ুন কবীর - আবদুর রহমান রাজু

উপরোল্লিখিত শিরোনামে *(রিয়াদ ডেইলী-র বাংলা বিনোদন)* এ প্রকাশিত খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের একটি বিতর্কিত লেখার উত্তর আমরা *বাংলা বিনোদন*কে দিয়েছিলাম, জনাব হোসেনের লেখাটি প্রকাশিত হবার (প্রকাশের তারিখ ১৩ জুলাই ২০০১ বৃহস্পতিবার, রিয়াদ, সৌদি আরব) মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই। কিন্তু আমাদের সেই লেখা আজও প্রকাশিত হয়নি বলে (প্রায় বছর গড়াতে চলেছে) একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে উক্ত প্রকাশিত লেখাটির উত্তর আমাদের সাহিত্য পত্রের মাধ্যমেই দিতে বাধ্য হলাম। প্রমানিত হলো *বিনোদন* সম্পাদক সাংবাদিকতার কোন নিয়ম - কানুনকে মোটেই তোয়াক্কা করেন না। হতে পারে তিনি সাংবাদিকতার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে মোটেই অবগত নন। কিংবা এও হতে পারে তিনি (বিনোদন সম্পাদক) ইচ্ছে করেই আমাদেরকে প্রবাসী চাঁদপুর জেলাবাসীদের অবজ্ঞার ঘোলাজলে ফেলে রেখেছেন।

১৩ জুলাই ২০০১ বৃহস্পতিবার রিয়াদ ডেইলীর বাংলা বিনোদন এ প্রকাশিত জনাব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের *কেমন আছি আমরা প্রসঙ্গে*-র লেখাটি আমাদের পড়ার সৌভাগ্য(!) হয়েছে। আমরা সে আলোকেই কিছু বলতে চাই। জনাব হোসেন একটি প্যারাতে লিখেছেন- উল্লেখ্য আশির দশকে কোন সাহিত্য সাময়িকী একই নামে তিনটি সংখ্যার বেশী প্রকাশিত হয়নি। আবার অন্য প্যারাতে গিয়ে হঠাৎ করেই তিনি অন্যান্য লিটল ম্যাগের নামের সঙ্গে *মরুপলাশ* এর নাম উল্লেখ করে বললেন *মরুপলাশ* হাতে লেখা বর্ষপূর্তি সংখ্যা-১৯৮৮। দুতিনটি সংখ্যা ম্যাগ দিয়ে বর্ষপূর্তি সংখ্যা নিশ্চয়ই হয় না। (মরুপলাশ সাহিত্য আসরের জন্ম ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিজয় দিবসের একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। হাতে লেখা ফটোকপি সংকলনটি ছিলো ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসের ৫ম সংখ্যা, মানে ১ম বর্ষপূর্তি সংখ্যা। যাতে শুভেচ্ছা বাণী ছিলো তদানীন্তন এখানকার বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল গাজী গোলাম দস্তগীর(অবঃ)। ১ম সংখ্যাটির শুভেচ্ছা বানী লিখেন সউদী আরবে বাংলাদেশী প্রথম পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রদূত জনাব হেদায়েত আহমেদ (জুলাই ১৯৮৭) ওনার এমনতরো তথ্যগুলো ছিলো পরিস্কারভাবেই পরস্পর বিরোধী। ওনি অন্যান্য দলীয় যে মুখপত্রগুলোর নাম করেছেন। যাকে শুধু দলীয় খবর বা বানী সর্বস্ব বুকলেটই বলা চলে। অন্যান্য ইস্যু ভিত্তিক প্রকাশনাগুলোকে সাহিত্যপত্রিকা বলা যায় না। অথচ বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম মুখপত্র *মোহনা* র নাম তিনি একবার ও উল্লেখ করলেন না। *মোহনা* তো নিরেট সাহিত্য পত্রিকাই। সেখানে শুধুমাত্র সাহিত্যের স্থানই রয়েছে। মনে

হয়েছে তিনি খুব চতুরতার সঙ্গে তা এড়িয়ে গেলেন। অথচ এমন একটি সংগঠনের জন্ম না হলে জনাব হোসেনেরও লেখক হিসেবে জন্ম হতো না এই মরুর দেশে। বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামের কর্মকর্তারাই গঠন করেছিলেন বাংলা রাইটার্স ফোরাম। যা তারা একটি বিশেষ সভার মাধ্যমে প্রায় সকল নির্বাহীর সমর্থনে বিলুপ্ত করে দিয়ে বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম গঠন করেন। যে সভাতে আমি নিজেও জনাব আমিনুর রহমান আমিনের মতো ফোরামের কেহ না হয়েও একজন শুভাকাংখী হয়ে উপস্থিত ছিলাম। সেদিন কিন্তু জনাব হোসেন সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না। সোজা কথা ওনি ফোরামের কখনই কেউ ছিলেন না। তাই তারপক্ষে ফোরামের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। বিলুপ্ত করা বাংলা ফোরাম যারা টিকিয়ে রেখেছেন তাদের সাধুবাদ জানাতেই হয়। একই নামে একাধিক সংগঠন থাকতে পারে এবং একাধিক ম্যাগও থাকতে পারে। তাতে দোষের কিছু নেই বা গ্রামারও অশুদ্ধ হয়ে পড়ে না। যারা বাংলা ফোরাম জিইয়ে রেখেছেন, তাদেরই বদৌলতে যে প্রকাশনা তাতেই জনাব হোসেনের লেখক হিসেবে জন্ম হয়েছে। জনাব হোসেন বিনোদন সম্পাদক অহিদুল ইসলামকে চিনেন সম্ভবত: নিজ প্রয়োজনেই। কিন্তু একজন অহিদুল ইসলাম সম্পাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম মুখপত্র *মোহনা*/ র প্রথম সংখ্যার মাধ্যমেই। জনাব হোসেন জনাব অহিদুল ইসলামের নাম উল্লেখ করলেও মোহনা কে বারবার এড়িয়ে গেছেন। একজন ইতিহাস বেত্তার কাছে এমনটি আশা করিনি। জনাব অহিদুল ইসলাম বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামের সাধারন সম্পাদক ছিলেন এখনও আছেন। তার ব্যক্তিগত ব্যস্ততার জন্য ফোরামকে সময় দিতে পারেননি। তিনিতো ফোরাম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন না। আমরা সবাই বন্ধুত্বের সহঅবস্থানেই আছি। সম্পর্ক ছিন্ন শব্দটি কোন তথ্যবলে জনাব হোসেন ব্যবহার করলেন তা বোধগম্য নয়।তিনি সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। অথচ পরোক্ষভাবে তিনি চাঁদপুর জেলাবাসীকে অবহেলা আর অবজ্ঞা করে গেছেন।

কেমন আছি আমরা প্রসঙ্গে দু'টি কথা

গেল ১৩ জুলাই ২০০১ 'রিয়াদ ডেইলী' র 'বাংলা বিনোদন' এর পাতায় প্রকাশিত জনাব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের 'কেমন আছি আমরা প্রসংগে'র লেখাটি আমার মগ্ন চৈতন্নের দেয়াল ভেঙ্গেছে বলেই দু'চারটি কথা বলতে হচ্ছে। জনাব দেলোয়ার তার লেখার প্রথম প্যারাতেই 'নসিহত' শব্দটি ব্যবহার করে প্রকৃতপক্ষে শব্দটিকেই তিনি অপমান করেছেন। শব্দ চয়নে তিনি পারদর্শী বলে মনে হয়না। চতুর্থ প্যারাতে রিয়াদের সাহিত্যাঙ্গন বলতে ওনি কী বোঝাতে চেয়েছেন তা আমার বোধগম্য নয়। যেহেতু এটা আরব দেশ; সেহেতু আরবী সাহিত্যাঙ্গনই বোঝানো হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে ওনার লেখাতে ওনি রিয়াদের সঙ্গে 'বাংলা' শব্দটি ব্যবহার না করেও রিয়াদের বাংলা সাহিত্যাঙ্গন সম্পর্কে কথা বলেছেন। একই প্যারাতে তিনি 'বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্যোগে'

শব্দত্রয় ঘৃনা এবং তাচ্ছিল্য মিশ্রণে ব্যবহার করেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। অথচ লেখকের উচ্চারিত সেই বিশেষ গোষ্ঠী দ্বারাই কিন্তু বাঙলা সাহিত্য এ মরুভুমিতে আজো বেঁচে আছে। যে সময়ের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন , তখন কিন্তু এ লেখকের নাম গন্ধ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। তারও অনেক পরে এসে শুধুমাত্র রাইটার্স জন্ম নেয়াতে লেখকেরও জন্ম হয়েছে। এ লেখককে বিশেষভাবে সাধারণ পাঠকের কাছে 'বাংলা বিনোদন' ই পরিচিত করে তুলেছে। সে কথাটি কিন্তু তিনি একটিবারও উচ্চারণ করেন নি।

এই একই প্যারাতে তিনি লিখেছেন -'উল্লেখ্য আশির দশকে কোন সাহিত্য সাময়িকী একই নামে তিনবারের বেশী প্রকাশিত হয়নি'। অথচ ৬ষ্ঠ প্যারাতে গিয়ে তিনি অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনের নামের সঙ্গে উল্লেখ করলেন- 'মরুপলাশ' (হাতে লেখা বর্ষপূর্তি সংখ্যা-১৯৮৮ইং)। ওনার এ বক্তব্যগুলো পরস্পর বিরোধী নয় কি? এই ইতিহাস লেখকের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, 'মরুপলাশ সাহিত্য আসর' গঠিত হয় ১৯৮৪ সালে। প্রথমে ইহার কর্মকান্ড সাহিত্য সভা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ছিলো। এর পর 'মরুপলাশ' নামে একটি অনুপম সাহিত্য পত্র মানে লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম হয়। (নিয়মিত দৈনিক এবং সাপ্তাহিক প্রকাশনা ছাড়া আর যা কিছু প্রকাশিত হয় (দেশে কিংবা বিদেশে) তার সবগুলোই লিটল ম্যাগাজিন।) ''বাংলাদেশ লিটল ম্যাগাজিন পরিষদ'' কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি (ঢাকার) আমি একজন সম্মানিত সদস্য। জনাব হোসেনের বার বার উচ্চারিত সাহিত্যপত্র-সংকলন-পত্রপত্রিকা ইত্যাদি শব্দগুলোর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ওনার অভিজ্ঞতার ভান্ডারে রাখার জন্য একথাগুলো সরবরাহ করা হলো। 'মরুপলাশ' প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৮৭ইং। এর যাত্রা শুরু হয় সদ্য প্রয়াত সউদী আরবে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত জনাব হেদায়েদ আহমেদ এর শুভেচ্ছা বাণী নিয়ে । ৫ম সংখ্যাটি ছিলো ১ম বর্ষপূর্তি সংখ্যা। যাতে ছিলো সে সময়ের (১৯৮৮ইং)সউদী আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল কাজী গোলাম দস্তগীর (অবসর) এর উচ্চসিত প্রশংসার শুভেচ্ছা বাণী। 'মরুপলাশ' একই নামে শুধূমাত্র আশির দশকেই ১৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। যা অদ্যাবদি বিরামহীনভাবে একই নামে প্রকাশিত হয়ে চলছে। এ পত্রিকা কারো দান-খয়রাত, বিজ্ঞাপন এবং কারো পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই আজো টিকে আছে বহাল তবিয়তে। যা অন্য যেকোন ছোটবড় সংগঠনের মুখপত্রের বেলায় বিরল। (''বাংলা বিনোদন'' কে 'মরুপলাশ' এর শুরু থেকে চতুর্থ সংখ্যার প্রচ্ছদের কপি ও ১ম বর্ষপূর্তি সংখ্যটি প্রেরণ করা হলো।কেননা এ লেখাটি প্রকাশ করতে গেলে সম্পাদকের এ সকল তথ্যের সমর্থনে সকল দলিল-পত্র দরকার পড়বে বলে আমি মনে করি।) এ মরুপলাশকে নিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যিকমহলে কৌতূহলের অন্ত ছিলো না। তাইতো ১৯৮৯ সালের ১লা এপ্রিল রাত ৯টায় বাংলাদেশ টেলিভিষন শিল্প-সাহিত্য ভিত্তিক 'প্রচ্ছদ' নামক অনুষ্ঠানে সাড়ে ৪ মিনিট মরুপলাশ সম্পাদকের একটি সাক্ষাতকার প্রচার করে। যে সাক্ষাতকারটি গ্রহন করেছেন কবি আসাদ চৌধূরী। দ্বিতীয় দিন মানে ২রা এপ্রিল ১৯৮৯ইং ছিলো আমার লেখা দ্বিতীয় গ্রন্থ (ছড়া)'কিচিরমিচির' এর

প্রকাশনা উৎসব। যে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন লোক সাহিত্যের গবেষক ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে কবি আসাদ চৌধুরী ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। তখন ছিলাম আমি ছুটিতে দেশে। সেই একই মাসে মানে ১৩ এপ্রিল ১৯৮৯ইং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে বাংলাদেশ লিটল ম্যাগাজিন পরিষদ (বালিম্যাপ) কুমিল্লা শাখার উদ্যোগে অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন আহমদ এর সভাপতিত্বে আমাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিধ ডক্টর আবদুল কাদের। বিশেষ অতিথি যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শান্তনূ কায়সার, অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন ভৌমিক ও ডক্টর জয়নাল আবেদীন উল্লেখযোগ্য। আমার প্রথম গ্রন্থ ছিলো গল্পগ্রন্থ। 'প্রেম অনলে' যা প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে ঢাকার লেলিহান সাহিত্য প্রকাশনী থেকে। যা খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত (১৯৯৮ইং) "*বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান*" এর ৮৮নং পৃষ্ঠায়। সেখানে রয়েছে আমার নাম-ছবি-প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা, তার সঙ্গে রয়েছে প্রকাশনার সালও। অতএব আমি জানি মধ্যপ্রাচ্যে অনেক সম্মানিত বাঙালি লেখক রয়েছেন। হয়তো তাঁদের একাধিক গ্রন্থও রয়েছে। কিন্তু একমাত্র আমি ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের আর কোন বাঙালি (বাংলাদেশী) লেখককে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত লেখক অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতারং বাংলা একাডেমীর একজন তালিকাভুক্ত লেখক হয়ে আমি জনাব খন্দকারের লেখা ৪র্থ প্যারার মনগড়া তথ্যগুলো মেনে নিতে পারলাম না। এ যেন ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ব্যর্থ চেষ্টা।

১১নং প্যারাতে লিটল ম্যাগাজিন 'রাইটার্স ' এর সঙ্গে এনে যুক্ত করেছেন জনাব আনিসুর রহমান এর নাম । এ প্রকাশনার বহু পূর্ব হতেই ওনি ফোরামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জনাব আনিসের অবদান খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। তাকে এত পরে এনে স্থান দিয়ে ইতিহাসবেত্তা খন্‌কার সাহেব সুবিচার করেন নি। বরং এ ইতিহাস লেখক নিজে কখনই বাংলা রাইটার্স ফোরামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। কেন না বাংলা রাইটার্স ফোরাম যখন কুয়েতী বিল্ডিং এ জনাব ফারুক সাহেবের বাসায় (যিনি বর্তমানে কানাডাবাসী) জন্ম নেয়। তখন তিনি ছিলেন (খন্দকার) দাওয়াতী মেহমান। তার সঙ্গে এখন যারা আছেন তারাও অনেকেই। তার পূর্বে সে বাসাতে ৪ টি সাহিত্য সভা হয়েছে। কেউ ভাবতেই পারেন নি কী নাম দেয়া যায়। হঠাৎ করেই আমি আমার জন্মদিন (আটত্রিশ বসন্তের ফুল) নামক একটি অনুষ্ঠান করি। বাংলা রাইটার্স ফোরামের অগ্রনায়ক জনাব অহিদুল ইসলামের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি ব্যানার লিখে নিয়ে আসি। *বাংলা রাইটার্স ফোরাম*। তখন সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন। মৃদু গুঞ্জনও শোনা গিয়েছিলো । কেননা নামের বিষয়টি কাউকে পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। জানানোও হয় নি। পূরো অনুষ্ঠানটি সেদিন আমি একাই স্পন্সর করেছিলাম। আশা করি এসব কথাগুলো লেখকের অবশ্যই মনে আছে। নাখিল প্যালেসে যখন আমরা

(বাংলা রাইটার্স ফোরাম) স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান করি, যাতে প্রধান অতিথি ছিলেন রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত, বর্তমানে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত) জনাব কামাল উদ্দীন সাহেব। সে অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি লিপলেট ছাপা হয়েছিলো । সেখানেও জনাব দেলোয়ারের নাম কোথাও নেই। ফোরামের তখনকার নিয়মিত মাসিক সাহিত্য সভাগুলোর দু' একটিতে মাঝে-মধ্যে ওনাকে দেখা গিয়েছে। ওনি আসতেন ১০/১৫ মিনিট পরই কাউকে কিছু না বলে চলে যেতেন। যে ফোরামে তার কোন ভূমিকাই নেই; অথচ উক্ত লেখায় ফোরামের তিনি পিতৃত্বের দাবীদার হয়ে বসেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কেউ কেউ। লিটল ম্যাগাজিন "*রাইটার্স*" একটি সুন্দর প্রকাশনা। এ নিয়ে আমার কোন আলোচনা নেই, সমালোচনা নেই, বরং আমি এর দীর্ঘায়ু কামনা করি। তবে একটি কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, কবি শাহজাহান চঞ্চল এর পেছনে আছেন বলেই 'রাইটার্স' এখনও বৈচিত্র নিয়ে বেঁচে আছে ।

জনাব খন্দকারের লেখার ১১নং প্যারার শেষ ৫ লাইনের উত্তরে বলতে হয় -লেখক বলেছেন, 'অজ্ঞাত কারনে জনাব অহিদুল ইসলাম,রিংকু সারথি এবং দেওয়ান আবদুল বাসেত 'বাংলা' থেকে বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম নামে আরও একটি নতুন ফোরাম গঠন করেন। কয়েকমাস অতিবাহিত হওয়ার পর জনাব অহিদুল ইসলাম নবগঠিত বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম থেকে তার সম্পৃক্ততা ছিন্ন করেন এবং রিংকু সারথি তাকে অনুসরণ করেন'।

উপরোক্ত কথাগুলোর উত্তরে বলতে হয় - জনাব হোসেন সাহেব ২৮ নভেম্বর ১৯৯৮ইং জনাব আনিসুর রহমানের বাসায় যে বিশেষ সভাটি হয় তাতে কিন্তু আপনি উপস্থিত ছিলেন না। সেখানে শুধূ বাংলা রাইটার্স ফোরামের লোকজনই ছিলেন।

যেমন- জনাব আনিসুর রহমান, রিংকু সারথি, দেওয়ান আবদুল বাসেত, মো: মোখলেছুর রহমান মানিক, মো:আজমল হোসেন, শেখ আবুল বাশার, অহিদুল ইসলাম, এম,এ, সামাদ, শাহজাহান চঞ্চল, বাতেন রহমান, মো: খোরশেদ আলম প্রমুখগন। এই এগারজন ছাড়া ফোরামের সদস্য না হয়েও একজন শুভাকাংখী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আমিনুর রহমান আমিন।

উল্লেখিত জরুরী বিশেষ সভায় উপস্থিত ১২ জনের মধ্যে ১১জনই ছিলেন বাংলা রাইটার্স ফোরামের নির্বাহী কমিটির সদস্য। সেদিনের সভায় উপস্থিত সবার স্বাক্ষর করা কাগজটি আমার কাছেই বর্তমান। তা অবগতির জন্য কপি প্রেরণ করা হয়েছিলো "বাংলা বিনোদন" সম্পাদকের বরাবরে। (যদিও বাংলা বিনোদন সম্পাদক সততা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তিনি আমার এ লেখাটিও তার প্রকাশনায় প্রাকাশ করেননি ।

যেহেতু জনাব খন্দকার বাংলা রাইটার্স ফোরামের তখন কেউ ছিলেন না, উপস্থিতও ছিলেন না। সেহেতু ওনার পক্ষে সম্ভব নয় এর ইতিহাস লেখা। সেদিনের সভায় দুটি বিষয়ে আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। সবাই ছিলো চরম উত্তেজিত। সবার মতেই সেদিন 'বাংলা রাইটার্স ফোরাম' বিলুপ্ত ঘোষনা দেয়া হয়। তারপর একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন তৈরীর তাগিদেই

আমরা বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম গঠন করি। সেখানে যোগদান করেন দু'একজন বাদে সবাই। তাঁদের মধ্যে জনাব আনিসুর রহমান ও জনাব শাহজাহান চঞ্চল বিলপ্ত করা (বাংলা রাইটার্স ফোরাম) নামটি জিইয়ে রেখে নতুন করে সংগঠন দাঁড় করান। উক্ত কথার আলোকে আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে যাই নি। কারো সঙ্গে সম্পৃক্ততা 'ছিন্ন' করিনি।
এক্ষেত্রে লেখক 'ছিন্ন' শব্দটি ব্যবহার করে নিজের সাথে সবাইকে অপমান করেছেন। এশব্দটি শুধুমাত্র ''তালাক'' এর কাছাকাছিই বেশী মানানসই। যদি লেখক যে দু'জনের বদৌলতে আজও বাংলা রাইটার্স ফোরাম বেঁচে আছে যার ফসল রাইটার্স এর মাধ্যমে এ লেখকে জন্ম। সে দু' জনকে নিয়ে বেশী বেশী লিখলে আমরা বেশী খুশি হতাম। অতএব উক্ত কথিকার কথক জনাব খন্দকারের পূনরায় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, কোনকিছু না জেনে জনাব হমায়ুন কবীরের তথ্য সংশোধন করতে গিয়ে নিজেই কতগুলো বেহদা তথ্য সরবরাহ করে পাঠকমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।
প্রার্থনা করি লেখক জনাব খন্দকারের কলম সত্য ও সুন্দরের জন্যই শুধূ শানিত হউক।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, 'মরুপলাশ'
প্রধান সম্পাদক
রূপসী চাঁদপুর, মোহনা
রিয়াদ, সউদী আরব।

শিশু সাহিত্যিক দেওয়ান আবদুল বাসেত এর

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

ছড়া গ্রন্থ ঃ

(১) কিচিরমিচির ১৯৮৯ইং (২)ভোরের শিশির ১৯৯৭ইং

(৩) বৃষ্টিকে চিঠি ১৯৯৮ইং (৪) লড়াই (রাজনৈতিক ছড়া)১৯৯৯ইং
(৭) ভাল্লাগে না ধুর্ (কিশোর কাব্য) ২০০০

গল্প গ্রন্থ

(৮)'প্রেম অনলে' ১৯৮২ইং (৯)'রেজিয়াদের উপখ্যান' ১৯৯৬ইং

সম্পাদিত যৌথ কাব্যগ্রন্থঃ

(১০) দেয়াল বিহীন কারাগারের প্রেম ১৯৯৮ইং

লেখকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ:

Email: dewana@ngha.med.sa
marupalash@yahoo.com